ডাউন খড়গপুর, আপ জংশন

নরেশ জানা

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ লগ্ন, সংক্রান্তি আগত প্রায়। শহর মেদিনীপুরের সাহেব নিবাসস্থল বার্জ টাউন ছাড়িয়ে তিন অশ্বারোহী রাজপুরুষ চলেছে সোজা পশ্চিমে। লালমাটি অধ্যুষিত সদ্য শুরু হওয়া চড়াই ভেঙে তারা চলেছে সেখপুরা গীর্জাকে পাশ কাটিয়ে। পথ চলতি মানুষ সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয় তাদের এটাই রেওয়াজ। যারা চেনেন তারা চিনতে পানের চেস্নাট ব্রাউন' আর 'ফকস্ গ্রে' রঙের ঘোড়ার সওয়ারিয়া খোদ জেলা কালেক্টরেট এবং তার দেহরক্ষী। খালি চেনা যায় না ওই লোকটিকে যে কিনা কালো কুচকুচে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছে, যার কোমর থেকে ঝুলছে পিস্তলের মত একটা বস্তু। দোনলা বন্দুকের মতো এই ক্ষুদ্র বস্তুটারও দুটো নল। তবে কি বিলেতে দু'নলা পিস্তলও রয়েছে? আদ্রা লাইন পেরিয়ে ঘোড়া তিনটে বাঁক নিলে দক্ষিণ - পশ্চিমে, কেউ কেউ মনে করেন সাহেবরা বোধহয় গোপগিরির দিকে যাচ্ছে। কাঁসাই -এর কোলে পাহাড় সদৃশ এই গোপগিরি থেকে মাঝে মধ্যে সাহেবরা 'সানসেট' দেখতে যায়। ঘন জঙ্গলাবৃত এই এলাকায় পূর্ববাহিনী কাঁসাই -এর বিপ্রতীপ উচ্চস্রোতে পশ্চিমের বেশকিছুটা তট প্রসারিত, উন্মুক্ত। শীতের মজে যাওয়া জলস্রোতের পরেও দক্ষিণ পশ্চিমে, কেউ কেউ মনে করলেন সাহেবরা বোধহয় গোপগিরির দিকে যাচ্ছে। কাঁসাই -এর কোলে পাহাড় সদৃশ এই গোপগিরি থেকে মাঝে মধ্যে সাহেবরা 'সানসেট' দেখতে যায়। ঘন জঙ্গলাবৃত এই এলাকায় পূর্ববাহিনী কাঁসাই -এর বিপ্রতীপ উচ্চস্রোতে পশ্চিমের বেশকিছুটা তট প্রসারিত, উন্মুক্ত। শীতের মজে যাওয়া জলস্রোতের পরেও দক্ষিণ পশ্চিমে অনেকটা অংশ শুনে বালি ছড়িয়ে হাটখোলা হয়ে পড়ে থাকে। সেখান দিয়ে যখন সূর্য নেমে গিয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে পাতাল প্রবেশ করে তখন তার লাল রং গুলে যায় পূর্বের বহমান স্রোতে। সাহেবদের চোখে তা 'ওয়াণ্ডাফুল'। হঠাৎ চমক ভাঙল এক পথচারির, এখন তো সবে মাত্র বেলা ১২টা, এখন সূর্যাস্ত! চকিতে বাইসাইকেলে চেপে পড়ে সে, যেমন করে হোক সাহেবরা পৌঁছনোর আগেই খবরটা পৌঁছুতে হবে গোপগড়ের বিশ্রামশালায়। রাজা নরেন্দ্রলাল খানের ব্যক্তিগত সহায়তার তখন মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা পালিত হচ্ছে। তাদের লুকিয়ে রাখা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। সেই লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলির মধ্যে নাড়াজোল, আবাসগড়ের পাশাপাশি গোপগড়ও রয়েছে। তাহলে কি গোপগড়ের বিপ্লবীদের খবর পেয়ে গেছে ইংরেজরা। সেখানেই তো এখন রয়েছেন নরেন্দ্রলাল খান। মাত্র ক'দিন আগেই রাজা এসেছেন নাড়াজোল থেকে গোপগড়ে।

গোপগড়ের দুই সর্দার হাতে প্রমাণ সাইজের বর্শা নিয়ে প্রাচীরের বাইরে ফটকের দু'পাশে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু তফাতে সেই সাইকেল আরোহী উৎসুক চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, যে রাস্তা দিয়ে সাহেবরা আসবেন। অনতিবিলম্বে তিনটি ঘোড়া এগিয়ে এল। কালেক্টর সাহেব মাথার টুপি খুলে মৃদু হেসে গোপ প্যালেস পেরিয়ে গেলেন, না, যা ভাবা হয়েছিল তা নয় সাহেবরা সোজা দক্ষিণে সানসেট পয়েন্ট -এর দিকেই এগিয়ে গেলেন।

গোপগিরির একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে থামল ঘোড়া তিনটি, একে একে নেমে এলেন তারা। সামনেই বিস্তৃত খাদ, পাহাড় থেকে নিচে পড়লে থেঁতলে গিয়ে শরীরটা পড়বে কাঁসাই - এর স্রোতে। দেহ মিলবে এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে অ্যানিকোটের গেটে, যেখান থেকে কংসাবতী ক্যানেল নেমে গেছে দক্ষিণ - পূর্ববাহী হয়ে। তখন সবেমাত্র মেদিনীপুর থেকে খড়গপুর অবধি রেললাইন পাতা শুরু হয়েছে। কাঁসাই -এর উপর অপরিসর একটা ব্রিজও তৈরি হয়েছে, সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে সিঙ্গল লাইন এঁকে বেঁকে চলে যাবে মহেশপুর, গোকুলপুর পার হয়ে খরিদা ছুঁয়ে সোজা খড়গপুর। ব্রিজটা করতেই ধকল গেল প্রচুর। ওপারের মহেশপুর, কোকুলপুর লোকার জমিদার খেমাশুলি সংলগ্ন চড়কাবনির পালে-রা রুখে দাঁড়ালেন। তারা তাদের জমির ওপর সেতু করতে এবং রেললাইন নিয়ে যেতে দেবেন না। বি. এন. আর কতৃপক্ষ নানা সমঝোতায় আসতে চাইলেন কিন্তু পালেরা অনড়। এমনকি এও প্রস্তাব দেওয়া হল যে খড়গপুর - মেদিনীপুর গন্তব্যের যাত্রীদের টিকিটের যা দাম তার থেকে মাথা পিছু আধ পাই রয়্যালটি দেওয়া হবে। পালরা রাজি হলেন না। মামলা হল, আপিল হল, সেই মামলা আপিল গড়াল কটকের কমিশনার, কোলকাতার বোর্ড অব রেভিন্যু শেষ অবধি প্রিভিকাউন্সিল। সব আপিল ডিসমিস, মামলায় পরাজয় এবং মামলা চালাতে গিয়ে পালদের জমিদারি অবধি উঠে গেল। মাত্র কয়েক বছর ১৮৯৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়ে গেছিল। তারই জোরে শেষ অবধি কাঁসাই -এর ওপর সেতু সম্পূর্ণ হল। সেই সেতুর দিকে তাকিয়েই রইলেন কালোঘোড়ার সওয়ার, কোমর থেকে বের করে আনলেন যেটা, সেটা ভুল করে ভাবা দোনলা পিস্তল টিস্তল নয়। একটি শক্তিশালী বায়নোকুলার। দু-চোখে লাগিয়ে ডাঁয়ে, বাঁয়ে সামনের দিকে তাকালেন। সামনে চড়া রোদ, বাঁহাতে বায়নোকুলারখানা ধরে ডানহাত খানা রাখলেন তার সামনে। এতে করে কিছুটা রোদ চোখে পড়া থেকে বাঁচানো গেল। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে সানের বিস্তৃত বনজঙ্গল ছাড়িয়ে সোজা দক্ষিণের ঈষৎ পূর্বদিক ঘেঁসে ভেসে উঠল এক ন্যাড়া টিলা, তার পেছনে আরও একটা। যেন উটের পিঠে জেগে থাকা জোড়া কুঁজ। তিনি জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে তাকালেন কালেক্টর সাহেবের দিকে। কালেক্টর সাহেব বললেন, ''মিঃ রিচার্ডস, দ্যাট্ ইজ কড়াগপুর ডামডামা'' এতক্ষণে আগন্তুকের নাম জানা গেল। তিনি মিঃ রিচার্ডস। বি. এন. আর কতৃপক্ষের পাঠানো চিফ্ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এ অঞ্চলে একটি জংশন গড়ার দায়িত্ব নিয়ে সদ্য এসেছেন। ইনিই খড়গপুর জংশন, রেলকলোনির প্রধানতম স্থপতি। আর কালেক্টর সাহেবের 'কড়াগপুর ডামডামা' হল খড়গপুর দমদমা। ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তিক পাদদেশের শেষ চিহ্ন ওই চল্লিশফুট উঁচু টিলা দু'টি।

।।দুই।।

কালেক্টর তথা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সবিশেষ ইচ্ছা জংশন হোক জেলা সদর মেদিনীপুরেই। তিনি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা সি. এস.ই সাহেবকে বোঝালেন, জেলা সদরে জংশন গড়ে উঠলে কত সুবিধা। এখান থেকেই কত সহজে দিল্লি - বোম্বে - কলকাতা করা যাবে। খুব সহজে সৈন্য আনা যাবে, মালপত্র পাঠানো বা আনা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি দেখছেন প্রশাসনিক সুবিধার কথা, রিচার্ডস সাহেবের তাতে কি এসে যায়? তিনি তো সরকারের লোক নন, তিনি কোম্পানির লোক। কোম্পানির লাভের অংক যাতে বাড়ে তাকে সেদিকেই দেখতে হবে। আর যে সে কোম্পানি নয়, এ হল বি.এন.আর - বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি। এই তো সেদিন, মাত্র কয়েক বছর আগে ১৮৮৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরের ১৩২ নং ওল্ড স্ট্রিটের গ্রেশাম হাউসে তার জন্ম হয়েছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর টি. আর. ওয়াইনি বুঝেছিলেন এখন পয়সা রেললাইনেই। সেটা তারও আগে বুঝতে পেরেছিলেন মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতা হারানো রাজা - রাজড়ারা। তাই তারাই মিলিতভাবে তৈরি করেছিলেন বেঙ্গল - ছত্রিশগড় রেলওয়ে। তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েই ওয়াইনি নাম বদলে রাখলেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে। বরাত জুটে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। নাগপুর থেকে প্রথমে

বাংলাকে এবং তারপর ধীরে ধীরে সারা এলাকায় ছড়িয়ে দাও রেললাইনকে। প্রথম ক'বছরেই মোট লাভের অংক এসেছে ঘরে। কোম্পানির সাথে সাথে ফুলে ফেঁপে উঠেছে উচুঁতলার কর্তাব্যক্তিরা। তাই তারা বুঝেছেন কোম্পানি বাঁচলে বাপের নাম। কোম্পানির লোকসান হওয়া চলবে না। তাই অনেক চিন্তাভাবনা করেই রিচার্ডস সাহেব ঠিক করলেন জেলা সদর নয়, জংশন, কারখানা, কলোনি হবে খড়গপুরেই। রিচার্ডস সাহেবের এই ভাবনা চিন্তাগুলো ছিল এরকম। প্রথমত : মেদিনীপুরে জংশন করতে হলে কাঁসাই -এর ওপর আপ - ডাউন জোড়া ব্রিজ দরকার। এর ফলে আপাতঃভাবে কোম্পানির প্রচুর খরচ বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত: বড় বড় গাছগাছড়া বেষ্ঠিত জঙ্গলে প্রচুর কাঠ মিলবে প্রায় মুফ্‌তে। যা দিয়ে লাইনের স্লিপার এবং ঘরবাড়ির করিবরগা করা যাবে সহজেই। তৃতীয়ত : দূর থেকে ন্যাড়া টিলা দুটো দেখেই তিনি বুঝেছিলেন ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অধ্যুষিত অঞ্চলটি ঘরবাড়ি এবং বৃহৎ যন্ত্রপাতি স্থাপনের উপযোগী এবং ব্যয় সাশ্রয়কও বটে। সিদ্ধান্ত তো নিলেন, কিন্তু কালেক্টরের সাহেবকে বোঝাবেন কি করে? এই সুদূর বিভুঁই - এর সরকারের সাহায্য ছাড়া কোনো কোম্পানি কাজ করতে পারবে, সবেমাত্র জমি অধিগ্রণের পালা শুরু হয়েছে প্রজা বিদ্রোহ হতে পারে, জঙ্গল মহলে গাছকাটতে গেলে বনবাসীরা খেপে যেতে পারে, তারপর তো রয়েছে নানান ঝক্কি- ঝামেলা। এক পালরাই তো সেতু বসাতে কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে কোম্পানির। সরকারের পুলিশ সেনা ছাড়া কাজ চলবে কি করে? চিন্তায় ভ্রু কুঁচকে কালেক্টরেট সাহেবের 'ক্লাইভ হাউস' বাংলো থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়লো সেই ইংরেজ আই. বি অফিসারটি বাংলোয় ঢুকছেন। ক'দিন আগে বড়দিনের পার্টিতে সেখপুরার গীর্জায় তার সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন কালেক্টরেট সাহেব স্বয়ং। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আই. বি অফিসারটি বললেন, 'আপনার রেলজংশনের কতদূর?' 'ঐ চলছে'। দায়সারা গোছের একটি উত্তর দিলেন রিচার্ডস সাহেব নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্যই যেন আই.বি অফিসারটি বললেন, ''দেখুন ও সব করতে পারেন কিনা! যা সব শুরু হয়েছে'' 'কি হয়েছে?' উৎসুক হলেন রিচার্ডস। ''তা বলতে পারব না আপনাকে কারণ সেটা একমাত্র কালেক্টর সাহেবকেই আমি জানাতে যাচ্ছি। শুধু এটুকু বলতে পারি আগামী তিরিশ/পয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পাততাড়ি গোটাতে হবে এমপ্যায়ারকে।''। একটু বিজ্ঞের মতো বললেন আই. বি অফিসারটি।'' আর সে তো অনেক দূরের কথা। এখন কি হয়েছে বলুন। অধৈর্য্য হয়ে বললেন রিচার্ডস সাহেব।'' বরোদায় চাকরি ছেড়ে এ. ঘোষ তাই মিডনাপুরে আসছে পলিটিক্স করতে।'' ''কে এই এ ঘোষ? আর পলিটিক্স তো অনেকেই করেছে। তাতে এমপ্যাযারদের বিপদটা কোথায়?'' এ পলিটিক্স্ সে পলিটিকস্ নয় এ হল টেররিস্টদের পরিটিকস্ ভায়োলেন্স টেরর এন্ড অ্যাসাসিনেশন। আর এ. ঘোষ হল অরবিন্দ ঘোষ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুপ্তচর মাত্রই জানে এর ক্ষমতা।'' চলে গেলেন আই. বি অফিসারটি। রিচার্ডস সাহেব মনে মনে হিসাব করে নিলেন যদি ২০ বছর এই বি. এন . আর কোম্পানি ব্যবসা করতে পারে তাহলেই কেল্লা ফতে সুতরাং টেরিরিস্ট নিয়ে ওর আর মাথা ব্যথা কিসের? তারপর যেন তুরুপের তাসখানা আস্তিনের ভেতর থেকে খুঁজে পেয়েছেন এমন ভাবেই অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন, ''টেররিস্ট!'' মাত্র ২ দিন পরে বর্ষশেষের এক ডিনার পার্টিতে কথাটা তুললেন স্বয়ং প্রশ্নটার জন্য মিডনাপুরেই কিন্তু ব্রিটিশ রাজ্যের নিরাপত্তার কারণে সেটা বোধহয় কেন নিশ্চয়ই জানেন যে টেররিস্টদের সংখ্যা বাড়ছে এখানে, ইভন্ তারা নাকি এখন অ্যাস্যাসিন টিম তৈরি করতে চাইছে। সেক্ষেত্রে জংসনটা বিপদ বাড়াবে। এত বড় জংশন, সেখানে দুনিয়ার লোক আসবে যাবে তার ওপর ধরুন বোমা টোমা, না না কালেক্টর সাহেব, ইটস্ টু ডেঞ্জারাস ফর আস্, আই মীন আওয়ার এমপাইআর।'' অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন কলেক্টর। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''ইউ আর রাইট মিঃ রিচার্ডস্ আপনি বরং জংশনটা কাড়গপুরেই করুন। আপনার অসুবিদা হবে না, ইনফ্যাক্ট আমি যতদূর জানি ওকানকার জমিদারিটা বছর চল্লিশ আগে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট হাউসটন বলরামপুরের নেটিভ জমিদারদের কাছ থেকে বেশ কিছু খাজনা বাকি রয়ে গেছে সেটা মিটিয়ে দেবেন আপনারা তাহলেই আইনি সমস্যাটা মিটে যাবে। আসুন বাংলার ভবিষ্যৎ বৃহত্তম জংশনকে সেলিব্রেট করি আমরা।'' 'চিয়ার্স' গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে সমস্ত দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রিচার্ডস্।

।। তিন।।

পরেরদিনই লোক মারফত খবর গেল ওয়াটসন্ সাহেবের কাছে। ওযাটসন্ কোম্পানির একজন নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এই কোম্পানিতে। তার হাত ধরেই আদ্রা থেকে শালবনী এবং পরে শালবনী থেকে খড়গপুর অবধি ট্রেন লাইন এসেছে। রিচার্ডস সাহেব আসার আগে অবধি তিনিই এখানকার প্রধান ছিলেন। আবার তারই চেষ্টায় জমি অধিগ্রহণ করে পুবদিক থেকে পশ্চিমদিকে অর্থাৎ হাওড়ার দিকে মাটি ফেলার কাজ চলছে। ওয়াটসন্ সাহেবের সংগে সব সময় থাকতেন এক শিক্ষিত বাঙালি দোভাষি। ওয়াটসনরা এই দোভাষিকে বলতেন, 'ডুবাস্" ডুবাসরাও তখন কোম্পানির মোটা মাইনের কর্মচারী। খবর পেয়ে সেই ডাবাসকে বললেন, ''মল্লিক ভাল খবর আছে। এই খড়গপুরেই কোম্পানি জংশন আর ওয়ার্কশপ বানাচ্ছে, 'কদিনের মধ্যে বড়ো সাহেব এসে পৌঁচাচ্ছে খড়গপুর তখন শাল - সেগুন - বহড়াসহ নানা বৃহৎ ও গুল্ম ভরা জঙ্গল এলাকা। সেই জঙ্গলের মধ্যে হিড়ম্বডাঙা আর ইন্দা গ্রামের মধ্য দিয়ে মাথার সিঁথির মত সরু রাস্তা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। উত্তরে ইন্দ্রাগাম পেরুলে জলজঙ্গল চাষ জমি পেরিয়ে ওয়ালিপুর, নানারকম, বরগাইকে বাঁয়ে রেখে কাঁসাই পেরিয়ে জেলার সদর মেদিনীপুর অন্যদিকে দক্ষিণে বুলবুল চটি, মীরুপবুর হয়ে সোনামুখী ডাউনে রেখে বলরামপুর রাজাদের আড়াসিনগড়, চিত্রপুর, যাবদপুর পার হয়ে কাশীজোড়া গরুকে ডাইনে রেখে সোজা পথ চলে উড়িয়ে। এপথেই একসময় তীর্থযাত্রীরা শ্রীজগন্নাথ দর্শনে পুরী যেতেন। জৈন তীর্থঙ্কর থেকে গুরুনানক, শ্রীচৈতন্যরা এ পথেই একসময় নীলাচল দর্শনে গেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী আছে জলপথে বিপদের সম্ভাবনা আছে জেনে হিউ - এন - সাঙ এই পথ ধরেই কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ হয়ে মহারাষ্ট্র অবধি গেছিলেন। পথের ইতিহাস থাক। খড়গপুরের জঙ্গলে তখন হিংস্র শ্বাপদকুলের বাস। হায়না শেয়ালের পাশাপাশি নেকড়ে, হড়ায়, চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য ছিল। তবে এসবের চেয়েও ভয়ানক ছিল আরও একটি জিনিস, তা হল রুক্কিনী দেবী। প্রাচীন ওঁদা বা ইন্দার ঘনজঙ্গলে এই দেবীকে উপেক্ষা করে কেউ গেলেই তার বিপদ ছিল অবধারিত। রক্তপিপাসু এই দেবীকে খোদ ওয়াটসন্ অবধি ভয় পেতেন তবে সে কথা পরে বলা যাবে।

রিচার্ডস আসছেন, তাই সবচেয়ে ভালো তাঁবুটার ব্যবস্থা করলেন ওয়াটস্ন। তখন এরকমই ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান যে চাঁদমারি মাঠ আর সামান্য উত্তরে এস. ডি. পি. ওর বাংলোর পেছনে লাল কাঁকুরে মাটিতে ওয়াটসনের তাঁবুর পাশে তাঁবু পড়ল রিচার্ডসের। পাশাপাশি তাঁবুটা 'ডুবাস' মল্লিকের। হিসাবপত্তর রাখার জন্য বাঙালিবাবুদের আরও কয়েকটা তাঁবু 'এদিক ওদিক। আর সামান্য কিছু দূরে হোগলার ছাউনিতে কুলি কামিনরা। রিচার্ডসের ইচ্ছা ছিল শতাব্দীর শুরুতেই মানে শুরুর দিনটাতেই চলে যাবেন খড়গপুরে। মাঝে একবার কিছু সময়ের জন্য জায়গাটা দেখেও এসেছিলেন। সে মোতাবেক চাঁদমারির ময়দানের ধার ঘেঁসেই জংশন করার কথা ভাবছিলেন তিনি। এদিক- ওদিক দেখে স্থানটার সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে গেছিলেন। হিসাব করে দেখেছিলেন উত্তর - দক্ষিণ পূর্ব - পশ্চিম চারদিকেই রেললাইন ছড়াতে হবে যেহেতু জায়গাটা জংশন হবে। সুতরাং টিলা দুটো ফাটাতেই হবে, টিলা কেটে রেললাইন নিয়ে যতে

হবে। তাই ডিনামাইটের অর্ডার পাঠাতে হল নাগপুরে। সেই ডিনামাইট পৌঁছুতে সময় লাগল। ডিনামাইট এসে পেঁৗছানো মাত্রই পালকি করে খড়গপুর রওনা দিলেন আগ্রহের অধীর উত্তেজনায় তার খেয়ালই হল না বেলা তখন তিনটে। কালেকট্রি থেকে চাঁদমারি ময়দানের দূরত্ব প্রায় ১৭ কিলোমিটার। মাঝে নদী পার হয়ে ঘনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সাহেবের পালকি যখন ইঁদার জঙ্গালে পৌঁছাল তখন সূর্য নেমে গেছে হিজলীর জঙ্গলের ওপাশে। আরও এক ক্রোশ পথ পার হলে তবে চাঁদমারি বেহারাগুলো পালকি নামিয়ে মশাল জ্বালিয়ে নিল। সেই মশাল হাতে নিয়ে পাইকরা চলল আগে আগে জয় মা হিড়েম্বাশ্বরী। জয় মা রক্কিনী, জয়বাবা খড়েগশ্বর, জয় বাবা পীর লোহানী বাবার জয় বলতে বলতে পালকি চলতে লাগল। সাহেব দরজা ফাঁক করে দোনলা বাড়িয়ে রয়েছে।

।।চার।।

সেদিন খুব পরিশ্রম হয়েছিল ওয়াটসনের। বেশ কয়েকটি শাল, মহুয়া গাছ কাটিয়ে, পরিষ্কার করিয়ে ভিত্তি প্রস্তরের জায়গাটা বানিয়ে উঠতেই বেলা গড়িয়ে গেল। জানুয়ারির শীতেও যেন ঘামছিলেন তিনি, 'বুবাস' মল্লিক তো হাত - পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে খাটিয়ার ওপর। দূরে শুকনো পাতা ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর সেঁকেছে কুলি কামিনরা। কেউ কেউ দেহাতি গান জুড়ে দিয়ে মস্করা করছে। হটাৎ যেন ওয়াটসনের কানে এল ঝুমঝুম শব্দ। শব্দটা এদিকেই এগিয়ে আসছে মনে হল। মল্লিককে ডাকলেন ওয়াটসন। সবাইকে চুপ করতে বললেন। ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে যেন মানুষের গলার আওয়াজ। বাবুদের একজন বলল, ''মনে হচ্ছে খড়েগশ্বরী মন্দিরের কাপালিকটা আসছে। শুনেছি ওর হাতে খাঁড়া থাকে। নররক্ত ছাড়া ওর সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।'' ভয়টা ছড়িয়ে পড়ল মহামারির মতো। সবারই মুখ যেন রক্ত শূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মল্লিক অবশ্য অন্য কথা বলল, কিছুদিন ধরেই শুনছি জমি অধিগ্রহণ নিয়ে প্রজারা ক্ষেপে রয়েছে, বিশেষ করে পূর্বদিকের প্রজারা। যকপুরের মহাশয়রা নাকি ওদের খেপাচ্ছে। তারাই দল বেঁধে আসছেনা তো আক্রমণ করতে?'' ওয়াটসন তার দোনলাটা বার করলেন। গুলি ভরে মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন, পেছনে তিন চার পাইক এবং কয়েকজন কুলি। প্রায় এক কিলোমিটার জঙ্গলের কুলি ধরে এগুনোর পর ওয়াটসনের খেয়াল হল শব্দটা কাছাকাছি এসে গেছে। বন্দুকটা শক্ত করে ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন এবার।

রিচার্ডসের বেহারারা ততক্ষণ পীর - বাবার মাজার পেরিয়ে এসেছে। ঘনজঙ্গলের মাঝখানে হঠাৎ যেন কিসের খস্‌খস্‌ শব্দ হচ্ছে সামনের দিকে। তাহলে কি মানুষ খেকো বাঘ! ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাদের মুখ দিয়ে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে রিচর্ডস্‌ পালকি থেকে নেমে পড়লেন। সবার আগে আগে বন্দুকটা বাড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি, মনে মনে প্রস্তুত রইলেন যেকোন মুহূর্তের জন্য। একটা বাঁক পার হতেই রিচার্ডসনের মনে হল সরু রাস্তাটা হঠাৎই যেন বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা জুড়ে কালো ছায়ারা সামান্য দূরে নড়াচড়া করছে। দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। কিসের ছায়া! মানুষ না অন্যকিছু। ট্রিগারে তর্জনী রেখে চিৎকার করে উঠলেন, হুজ দেযার? শধু একটা মানুষের গলার আওয়াজের অপেক্ষা মাত্র। তারপর টিপে দেবেন ট্রিগার।' ''আ্‌ এ্যাম্‌ ওয়াটস্‌ন, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বি. এন. আর।'' ওয়াটস্‌ গলা চড়িয়ে বললেন। গলা জড়িয়ে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হলেন রিচার্ডস্‌ আর ওয়াটস্‌ন। যে গঙ্গা - যমুনার মিলন হল খড়গপুরের মাটিত। সবাই মিলে ফিরে এলেন তাঁবুতে। সেদিন ভুলবশত যেকোনো একজনের বন্দুক থেকে গুলি ছুটলে কি হত জংশনের ভবিষ্যৎ তা কেউ জানে না। 'ডুবাস' মল্লিকের সাথে আলাপ হল তাঁবুতে বসেই। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে রিচার্ডস্‌ বললেন বজ্র এনেছি সঙ্গে করে মল্লিক। এসেছি পালকি করে, ফিরব কিন্তু রেলে চেপেই, মাইন্ড ইট মল্লিক।' না। শেষ অবধি ফেরা হয়নি রিচার্ডস্‌ের।

।।পাঁচ।।

ওয়াটসন যে জায়গাটাতে প্রথমে জংশন তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন আর রিচার্ডস্‌ও সে স্থানে সম্মত হয়েছিলেন সে জায়গাটা চাঁদমারি ময়দানের কাছাকাছি। লোকে জায়গাটাকে ট্যাংরা বলে জানে। কেউ কেউ আবার বলে ছোট ট্যাংরা। উঁচু টিলা - দুটোর পূর্ব - দক্ষিণে ডাহি - ধরনের এলাকা। একটা সাপ্তাহিক হাট বসত এখানে। ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন হল এখানে। নাগপুর থেকে বড় কর্তা এসেছিলেন। ধুমধাম করে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হল। কুলি - কামিনদের একদিনের ছুটি। মদ - হাঁড়িয়ায় জমজমাট রাত। লে-আউটের কাজ শেষ ভিত খোঁড়ার কাজও শুরু হল। উঁচু নিচু জায়গা সমতল করার জন্য কোথাও মাটি কাটা হচ্ছে তো কোথাও সেই মাটি ফেলে ভরাট করা হেচ্ছে। মাটির একটা বড় স্তূপ করে রাখা হয়েছে। পাহাড় প্রমাণ সেই মাটির স্তূপ দেখতে ছেলেছোকরাদের ভিড় জমে প্রতিদিন। আরও কুলি কামিন আনার জন্য কোম্পানির আড়কাঠিরা ছুটছে বিসালপুর, রায়পুর, চিরিমিরি, চিন্দোয়ারা থেকে আরও দক্ষিণে সাবেক মাদ্রাজ প্রদেশ অবধি। এমন সময় এক বৃষ্টিই বদলে দিল সমস্ত পরিকল্পনাই। ফেব্রয়ারির একরাতের অকাল বর্ষণেই কোমর জল দাঁড়িয়ে গেল ট্যাংরা, চাঁদমারি, ঝুলি, বুলবুল চটি, সোনামুখী -সহ পুরো এলাকাতেই। মল্লিক খোঁজ নিয়ে জানল বর্ষাকালে এমনই জল দাঁড়িয়ে থাকে এই এলাকায়। জল জমে বলেই জায়গাটার নাম জুলি (ঝুলি) আর সেই জমা জলে প্রচুর পরিমান ট্যাংরা মাছ পাওয়া যয় বলেই জায়গাটার নাম হয়েছে ট্যাংরা। রিচার্ড দেখলেন সামনের টিলা দুটো থেকে সমস্ত জল গড়িয়ে নামছে এই এলাকায়। এপাশে জল জমলেও টিলা সহ চাঁদমারি ময়দানের উত্তর - দিকটায় জল দাঁড়াচ্ছে না। রিচার্ডস্‌ সিদ্ধান্ত নিলেন কারখানাগুলো হবে টিলা দুটোর ওপরেই, জংশন সরে যারে আরও উত্তরে আর চাঁদমারি ময়দানের নিকট উত্তরে যে সারিতে বর্তমান এস. ডি. পি ও সাহেবের বাংলোটা রয়েছে সেটাই হবে রেল কলোনির শেষ সীমানা। তার দক্ষিণে কোনো নির্মাণ কার্য হবে না। একটা রাস্তা তৈরি করা হল সেই সীমানা বরাবর। যদিও চাঁদমারি ময়দানের অনেক পূর্বে এগিয়ে গিয়ে কিছু নির্মাণ কার্য করা হয়েছিল পরের দিকে। চাঁদমারি ময়দানের সেই ডাঁই করা মাটির স্তূপটা রয়েই গেল।

জমি পাওয়া যতটা সহজ হবে বলে কালেক্টর সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন কাজটা কিন্তু ততটা সহজ হল না। আসলে তার কাছে সঠিক তথ্য ছিল না। ১৮৪০ সালে বলরামপুর রাজাদের জমিদারি নিলাম করে কোম্পানি তা হস্তগত করেছিল এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। ১৮৪৯ - ৫৩ সালে সেই জমিদারি মাপ জোপ করতে গিয়ে দেখা গেল বলরামপুর পরগণা ঠিকঠাক থাকলেও খড়গপুর এবং কোদারকুণ্ডু পরগণার অধিকাংশ জমিই আগেই রাজ - পরিবার অন্যদের বিক্রিকবলা বা দানপত্র করে দিয়েছে। যে জায়গাতে জংশন করা হবে বলে ঠিক হল সে,ই কালকাটিসহ আশেপাশের প্রায় ১৪ হাজার বিঘার মালিকানা কৌশল্যা নিবাসি নাটুয়া পরিবারের। নাটুয়ারা অবশ্য বলেছেন ১৪ ময় ৩৫ শত বিঘা জমি তাদের। নাটুয়ারা সম্ভবত : নাটক বা যাত্রা করত পেশাদারি ভাবে। নট থেকে নাটুয়া। তারা কবিগান গাইত, মুখে মুখে পালা বাঁধত। লোককবি বলা যেতে পারে। সেইরকম এক কবি লক্ষণচন্দ্র নাটুয়া এই জমি হস্তান্তর এবং খড়গপুরের নগরায়ণকে ধরে রাখলেন গানের মধ্যেই, এই লক্ষণবাবুর কাছ থেইে মূল - জমি কিনে নিয়েছিলেন বি. এন. আর কোম্পানি। লক্ষণবাবুর সেই গান হল—

প্রভু খড়েগশ্বর, খড়গপুর শহর
করলেন মনোহর, থেকে খড়গপুরে।
বাবার মহিমা অপার, করতে খড়গপুর প্রচার
দিলেন কার্য্যের বার বি. এন. আর ধরে।।

সেই স্থানে পূর্বে ছিল শালবন,
সেখানে করলেন পুষ্পের কানন,
জাতি যূথী, আদি পুষ্প অগনন
গন্ধে প্রাণমন আনন্দিত করে।।

পর্ণের কুটীর ছিল না যেখানে,
দোতলা তেতালা করালেন সেখানে,
তথা দিবা রাতি জ্বলছে বিজলী বাতি,
ইলেকট্রিক ফ্যান ঘুরছে প্রতি ঘরে।।

বাঘ ভালুক যথা ডাকিত সুস্পষ্ট,
তথায় করালেন তার অফিস পোষ্ট,
শুভাশুভ কষ্ট, অথবা অনিষ্ট,
হয় সর্বনষ্ট, খবর করে তারে।।

হিংসুক জন্তু যথা নাশিত জীব নানা
তথায় পুলিশ তথায়, আর নানান কারখানা,
সদাই দিবারাত্রি খাটছে বহুজনা,
করছে বাবুয়ানা, খাচ্ছে অন্ন করে।।

দয়াময় প্রভুর অসীম করুণা,
করিলেন সেখানে তিনটি ডাক্তারখানা
ব্যধিগ্রস্থ লোক এসে বহুজনা,
জীবন পায় তার দুর্ব্যাধির করে।।

পালসাঁড় আদি আটটি পুকুরে,
তুলে নিয়ে জল মাটি দিল ভরে।
জলের জন্য কূপ করলেন গোকুলপুরে,
নলবেয়ে জল ঘুরছে শহরে।।

সদা যথা ছিল দস্যুগণের রেলা,
স্টেশন করে সেথা করলেন নরের মেলা,
ম্যাজিক, বায়োস্কোপ, সার্কাস আদি খেলা,
হচ্ছে নিত্য নিত্য নানান প্রকারে।।

এমন দয়াল প্রভু কেহবে জগতে,
পাপী তাপী জানে উদ্ধার করিতে,
এনে দিলেন ট্রেন তীর্থস্থানে যেতে,
তেঁই নরনারী তীর্থে যেতে পারে।।

কালকাটি গ্রামে বাস ছিল মজার,
তুলে নিয়ে তথা করালেন গোলবাজার
এন্ট্রস স্কুল তাহে করে দেয় মজার,
হাজার হাজার ছেলে বিদ্যালাভ করে।।

লক্ষণ চন্দ্র বনে, স্টেশনে আদি যথা।
পঁয়ত্রিশ শত বিঘা মালিক ছিলেন পিতা,
বি. এন.আর গ্রহীতা, পিতা হয়ে দাতা,
বিশহাজার টাকায় দিলেন বিক্রি করে।।

১৯০০ সালের মধ্যেই জমি অধিগ্রহণসহ সমস্ত পর্ব মিটে গেল। এরপর কারখানা এবং জংশন গড়ার কাজ শুরু হল। একখানা রেললাইন ইতিমধ্যে খড়গপুর ছাড়িয়ে চলেছে হাওড়ার দিকে। কারখানা গড়ার জন্য প্রয়োজনিয় হল প্রথমেই টিলা দুটোর মাথা ভেঙে সমতল আকার জায়গা তৈরি করার। রিচার্ডস্ সাহেবই দায়িত্ব নিলেন ডিনামাইট দিয়ে টিলা ফাটানোর। এ বিদ্যা তখন কারুর জানা ছিল না। দুটো তেজি ঘোড়া দৈরি করা হল। নিয়ম ছিল মাটির মধ্যে ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে সলতেতে আগুন লাগিয়ে ঘোড়ায় চেপে দৌড় লাগাতে হবে। একটা শনিবার বেছে নিলেন রিচার্ডস্ সাহেব প্রথম ডিনামাইট ফাটানোর জন্য। উদ্দেশ্য রবিবার দিনটা একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে। এদিকে টিলা ফাটানোর জন্য রিচার্টসের সঙ্গি হতে চায়না কেউ। সবাই বলে ঐ টিলা দুটো দেবাত অধিষ্ঠান। ঐ টিলা ফাটালেই সবাই নির্বংশ হয়ে যাবে। ওয়াটসন ততদিনে মল্লিকের হাতধরে ভারতীয় চিন্তাধারার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি রিচার্ডসকে বললেন এ ব্যাপারে পুরোহিতদের মতামত নেওয়া দরকার। রিচার্ডস্ রাজি ছিলেন না। কিন্তু উপায় কি? একা তো আর কারখানা বসাতে

পারবেন না। আনা হল রাহাধন চক্রবর্তীকে। তিনি রিচার্ডস্ সাহেবের জন্ম তারিখ জেনে গণনা করে বললেন, শনিবার নয় রবিবার বিকালই হবে প্রশস্ত সময়। আর মল্লিকের কানে কানে জানালেন অল্প দিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যাবেন রিচার্ডস্। শুর হল টিলা ফাটানোর কাজ। দশটাকা মাইনেতে কোম্পানির পুরোহিত হয়ে গেলেন চক্রবর্তী।

কয়েকমাস পরে ২৪ জনের এক ইঞ্জিনিয়ারের দল এসে পৌঁছল খোদ ইংল্যান্ড থেকে। বি. এন. আর এদেরকে মোটা মাইনে দিয়ে কিনে নিয়েছে। এদের মধ্যে সেরা ছিলেন এক বাঙালি তার পদবী ছিল দত্ত। দত্ত সাহেব এসেই পরিষ্কার বলে দিলেন কোন বুজরুকী চলবে না। ওসব পুরোহিত - টুরোহিত হাটাও। ওয়াটসনের হস্তক্ষেপে চক্রবর্তীর মাস মাইনেটা বজায় রইল বটে তবে গণনা - টননা বন্ধ হয়ে গেল। রিচার্ডসের ডিনামাইট ফাটিয়ে ঘোড়ায় করে দৌড় লাগানোকে প্রিহিস্টরিক আইডিয়া বলে উপহাস করলেন দত্ত সাহেব। ততদিন ডিনামাইট অংক অনেকখানি বদলে গেছে। যতখানা পাহাড় ফাটাতে হবে মাপ করে ততখানি ডিনামাইট দিলেই হবে। আর কতদূর অবধি পাথর ঠিকরে যেতে পারে তাও জানা, সুতরাং ঘোড়ায় করে পালানোর দরকার কী? ঘোড়া দুটোকে পোলো খেলার জন্য দিয়ে দিলেন দত্তসাহেব। পুরনো জমানার রিচার্ডস্ বললেন, ঘরে বসে বসে মাইনে নাও, কিন্তু কাজকম্ম আর করতে এসো না। তুমি কাজ করলেই একটা না একটা গণ্ডগোল করে বসবে। তারপরও বেশ কিছুদিন ছিল রিচার্ডস্। কিন্তু কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলেন তিনি। নিজের মনে বিড়বিড় করতেন। একদিন হঠাৎ বাংলোয় পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। ভারতীয়-র কাছে অপমান নাকি টিলা ফাটানোর প্রতিফল কিসের জন্য পাগল হলেন বোঝা গেল না। হারাধন চক্রবর্তী খবরটা পেয়ে হাসলেন মনে মনে।

।। সাত।।

খড়গপুরের, বর্তমান ১নং - ৩নং প্লাটফর্ম যা কিনা বিশ্বের দীর্ঘতম প্লাটফর্ম নামে পরিচিত (দৈর্ঘ্য ১০১৫ মিটার)। তার লাগদায়ো রেললাইনগুলো সোজা চলে গেছে পূর্ব - পশ্চিম কার্যত এই লম্ব বরাবর রেললাইনগুলোই ভাগ করে দিয়েছিল খড়গপুর রেলনগরকে। লাইনের উত্তরে সাবেক কালকাটি, চিলখানা, পালখাড় পুকুরের অংশের ডাইনে ট্রাফিক, গোলখুলি, ইন্দা আর বাসে বড়বাতি, খরিদা মালঞ্চ অবধি প্রাথমিক ভাবে তৈরি হল এদেশীয় কুলি, কামিন, ইঞ্জিনের কয়লা যোগানদার, ফ্যায়ারম্যান, মেথরদের আর সামান্য কিছু উঁচুপদের কর্মচারীদের কোয়ার্টার। এগুলি পোর্টারখুলি, কাটিংখুলি, ১নং, ২নং থেকে ৭নং অবধি বিস্তৃত। হাজার হাজার মানুষ এই ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে থাকত প্রথম দিকে না ছিল ঘরে জলের লাইন, না বিদ্যুতের মডিল স্কুল। পোর্টারখুলির অবস্থা আরও খারাপ, দশটা ঘরপিছু একটা বারোয়ারি পায়খানা। একটা লাইব্রেরি ও একটা কমিউনিটি হল, একটা গীর্জা।

অন্যদিকে রেললাইনের দক্ষিনে তৈরি হল সাহেবপাড়া। এখানে কোয়ার্টারের চাইতে বাংলোর পরিমাণ বেশি। এক বিঘা জায়গার ওপর একেকটা বাংলো। ফুলে ভরা বাগান তার জন্য মালি।। বাংলোর লাগোয়া সারভেন্ট কোয়ার্টারে মালি, পাংখেদার, চাকর, বাবুর্চি, বেয়ারাদের থাকার ব্যবস্থা। ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান, বারান্দায় হাতে টানা পাখার ব্যবস্থা। দুটো গীর্জা ক্যাথেলিক এবং প্রোটেস্টান্ট, একটি সাহেবি কায়দার হাসপাতাল সেখানে সাহেবদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড। কনভেন্ট স্কুল, পাবলিক স্কুল। পোলো খেলার জন্য চাঁদমারি মাঠ, বন্দুক শেখার জন্য চাঁদমারি বা প্র্যাকটিস রেঞ্জ ইউরোপিয়ান ক্লাব এবং বল ডান্সের আসর, বিলিয়ার্ড, টেনিস কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য সাউথ ইনস্টিটিউট। কোনোভাবে উত্তরপাড়ার নেটিভ ছেলেরা দক্ষিণ পাড়ায় চলে এলে সাহেবরা নাকি কুকুর লেলিয়ে দিতেন। সাহেবদের জামাকাপড় কাচার জন্য তৈরি হল ধোবীঘাট।

হারাধন চক্রবর্তীকে তাড়িয়েছিলেন দত্ত - সাহেব। তাড়ানো সহজ ছিল কারণ হারাধনবাবু ছিলেন নেটিভ। কিন্তু পুরোহিততন্ত্রকে তাড়াতে পারেননি দত্তবাবুরা কারণ ইংরেজ পুরোহিত যাজকরা রেলকলোনিতে জাঁকিয়ে বসল কোম্পানির হাত ধরেই। দক্ষিণপাড়া সাহেবপাড়া, সেখানে দুটো কেন, দশটা গীর্জা হতে পারত কিন্তু উত্তরপাড়ায় গীর্জা কেন? এই উত্তরপাড়ায় থাকত অন্যদের সঙ্গে দক্ষিণভারতীয়রা। এদের মধ্যে কারা যেন রটিয়ে দিয়েছিল খ্রিস্টান হলেই বেতন বাড়বে এবং আরও সুযোগ পাওয়া যাবে। ওরা থাকত একনম্বর কোয়ার্টারগুলোতে দেখা গেল কাগজ কলমে না হলেও খ্রিস্টান হলেই বেতন বাড়ছে, কোয়ার্টারে জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ যাচ্ছে। পাদ্রীর সঙ্গে যোগসাজশে পুরো একনম্বর এলাকাটাই যেন রাতারাতি খ্রিস্টান হয়ে গেছিল।

।। আট।।

১৯০১ সালের শেষে শহরের জনসংশ্যা ৪০০০০ -এর কাছাকাছি দাঁড়াল। অথচ তার কিছুদিন অবধি পুরো - শহর জুড়ে জনসংখ্যা খুবই কম চিল। ১৯০১ সালে এই জংশন চালু হল। বোম্বাই - কোলকাতার মধ্যে সরাসরি রেল চলাচল শুরু হল। ১৯০৩ এ ৭৭ একর জায়গা জুড়ে তৈরি হল রেলইঞ্জিন কারখানার নির্মাণ। পরের বছর ওয়ার্কশপে উৎপাদন শুরু হল। ১৯১১ সালে বেঙ্গল - নাগপুর রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় হল খড়গপুর। ১৯২১ -এ শহর আরও বাড়ানো দরকার হল নিউ - সেটেলমেন্ট। মাথুরাকাটি, নিমপুরা ছুঁয়ে শহর ছুটল কলাইকুণ্ডার দিকে। ঐ সময় শহরের জনসংখ্যা ২১৫০০ এর কাছাকাছি। তবে এই জনসংখ্যা কিন্তু সমগ্র খড়গপুর শহরের এর মধ্যে রয়েছে রেল আঞ্চল। ১৯০১ সালে কেবলমাত্র রেল - অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ৩৫০০ মাত্র। ১৯২১ সালে সেটা ৭৫০০ এর কাছাকাছি তার মানে ২০ বছরে সমগ্র শহরের যেখানে মাত্র ১১৫০০ জনসংখ্যা বেড়েছিল সেখানে রেল অঞ্চলের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫০ এর বেশি।

খড়গপুর রেলশহর গড়ে তোলার স্থপতি যেমন ছিল বি. এন আর কোম্পানির ইংরেজ সাহেবরা তেমনি এই কৃতিত্বের আরেক অংশীদার হলেন আবিদ হোসেন নামের এক ভারতীয় ঠিকাদার। বর্তমান গোলবাজারের কাছে যে মসজিদ তারপাশেই ছিল আবিদ হোসেনের প্রাসাদোপম বাড়ি। পাঞ্জাবের মুসলিম আবিদ হোসেনের ঠিকাদারি ব্যবসা প্রসারিত ছিল বার্মা অবধি। ১৮৫৪ সালে বোম্বে থেকে থানে অবধি রেললাইন পাতার সময় ঠিকাদারি শুরু করেছিল। খড়গপুর পত্তনের সময় থেকেই আবিদ হোসেন ছিলেন মূল ঠিকাদার। সেই সময় একডজন বুলডোজার ছিল তার রেলের বড়কর্তা সি. এম. ই থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবধি সমীহ করত তাকে। না করে উপায় কি? বড় ব্রীজ মেরামত, তৈরি, রাতারাতি রাস্তা কিংবা ঘর বানাতে আবিদ হোসেন ছাড়া কাকে ভরসা করা যায়। আবিদ হোসেন না হয় অন্যতম স্থপতির ভূমিকা পালন করেছিলেন কিন্তু রেলনগরীর প্রধান কারিগর তো ভিনরাজ্যের শ্রমিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা এই রেলনগরীর পত্তনকে প্রথম দিকে ভালো চোখে দেখেন নি। কারণ এদের অনেকেই বাস্তুচ্যুত, জমিহারা হয়েছিলেন। তাছাড়া সবারই প্রায় সামান্য পরিমাণ জমিজমা রয়েছে কোন দুঃখে তারা চাকুরি করে চাকর হতে যাবে? প্রথম দিকটায় কোম্পানিরও গরজ ছিল না কারণ তখন দেশ জুড়ে স্বাধীন হওয়ার একটা হিড়িক পড়েছে। একে বাংলা তাই মেদিনীপুর জেলা তাই কোম্পানি ভরসাও পায়নি খুব একটা। গোলবাজার থেকে পোর্টারখুলি রেললাইনের ধারে ধারে পিপের মতো ছাদওয়ালা বাড়িগুলোর নরককুণ্ডুর বাসিন্দারাই

তখন শহর গড়ছে। আবিদ হোসেন আর তার অধীন ঠিকাদাররা আড়কাঠি দিয়ে লোক আনাচ্ছে মধ্যভারত, পশ্চিম ভারত আর দক্ষিণ ভারত থেকে। কাপড়, সাবান, কাচের চুড়ি , আয়না, তাগা, চুটকি, জার্মান সিলভারের ঝুটা গয়না নিয়ে আড়কাটিরা লোভ দেখিয়ে মালগাড়ি বোঝাই করে একেকটা গ্রাম উজার করে লোক আনত। প্রতিজন পিছু আড়কাটিরা পেত দশটাকা। এছাড়া যাওয়া- আসা খাওয়া সব পেত ঠিকাদারদের কাছে। বায়না দিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে আনা হত সেসব খরচও বহন করত ঠিকাদাররাই।

হয়তো না এসে উপাও ছিল না। তাদের। যেমন ধরা যাক কুলিদের কথাই। সাবেক বোম্বাই প্রদেশের একটি জাত ছিল যাদের ক্যোলি বা কাউলি বলা হত। এদের জমিজমা ছিল না, বামুনিরা এদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করত, ফলে কোথাও কাজকর্মও পেত না। গ্রাম ছেড়ে না আসার বিকল্প ছিল না খেতে পেয়ে মারা যাওয়া। এই ক্যোলিরাই নাকি ভারতে যন্ত্রসভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল। ক্যোলি থেকে কুলি। ঠিক এরকমই ছিল সাবেক মাদ্রাজপ্রদেশের পারিয়াররা। অস্পৃশ্যতার এমন 'অভিশাপ' ছিল এদের ওপর যে এদের মুখ দর্শন করাতেও অশুচি হয়ে যেত বর্ণবাদী সমাজ। পেটের খিদে নিয়ে রাস্তায় যদি রুটির জন্য বের হত এবং যদি কোনো ব্রাহ্মণের সংগে দেখা হয়ে যেত তাহলে চলত অকথ্য অত্যাচার। রেল কোম্পানির চাকরিতে এরাই সবার আগে ছুটে এসেছিল। উড়িষ্যার মেথর, ধাঙড়দেরও জীবন ছিল এরকমই।

এদের সামনে প্রতিদিন আট-আনা মজুরি লোভ রাখল আড়কাঠিরা। বৌ-মরদ সবারই কাজ হবে। পরিবার পিছু মাসে কুড়ি - বাইশ টাকা আয় তার মানে তো অনেক টাকা! ফায়ার ম্যান তখন মাসে পায় সাত টাকা, ড্রাইবার বারো টাকা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলে কোম্পানির কমপেনসেশন একশ কুড়ি টাকা। তাই ওই টাকাই অনেক মনে হয়েছিল শ্রমিকদের। গ্রামে থাকতে নুন ছাড়া কিছু কিনতে হত না। তাই আট আনা মজুরি শুনে ভাবত নুনের পয়সা টুকু ছাড়া বোধ হয় সবই বাঁচবে, সঞ্চয় হবে ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু এখানে এসে দেখল আট আনায় দুবেলা পেট ভরে ভাতই জোটানো মুশকিল। তখন সবাই ভাবত পালাবে। কিন্তু আড়কাঠিরা তার আগেই চিনিয়ে দিত - ধনীরামের মদের ভাটি, আগাম দিত পনের বিশ টাকা। সে টাকা জীবনে শেধ হত না তাদের, তাই যাওয়াও হত না ফিরে। বরং সারা সপ্তাহ কাজ করে রবিবার দিনটাও তারা বাজারের ধারে যদি কোন বাবু বা সাহেব তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য একদিনের মজুরি দিয়ে নিয়ে যায়।

।। নয়।।

ডাক এবং তার অফিস তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। টাউন - থানা পার হয়ে সোজা ওভার ব্রিজ পার হয়ে গোলবাজার ঢোকার মুখে ডানদিকে নেটিভ গীর্জা রাখলে বাঁদিকের স্লেট - অফিসটাই খড়গপুরের প্রথম রেলওয়ে ডাকঘর। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান রাবণ ময়দানের পেছনে তৈরি হল কবরখানা, সিমেট্রি। একটাই সিমেট্রি তাই তিনভাগ করে একপাশে ক্যাথলিক, অন্যপাশে প্রোটেস্টান্টদের সমাধির ব্যবস্থা। আরেক পাশে রেখে দেওয়া হল টাকা বাড়ার লোভে খ্রিস্টান হওয়া এদেশীয় মানুষদের জন্য, যাদের গায়ের রং কালো। এখানেই শুয়ে আছে জেমস্ টমাস (১৯১৩), এ্যানি বাটলার (১৯১৩) কিংবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৈমানিক আর. ডব্লু. মরগ্যান (১৯১৯) অথবা সাতনম্বর শপের অ্যাসিস্টান্ট ফোরম্যান জেমস পিটার (১৯৪৫)। কত গল্প লুকিয়ে আছে এদের সাথে। যেমন গল্প রয়েছে জন কোলম্যান আর সীতা কোলম্যান - এর জোড়া কবরে। সুদূর বেলফাস্ট থেকে আসা কোলম্যান সাহেব ধুতি পরতেন। পীরান চাপাতেন গায়ে। আর গড়গড়িয়ে হুকো টানতেন। আর বাঙালি প্রীতি ছিল ষোল আনা। কলোনির ব্যানার্জীদের মেয়ে সীতা, কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, যার বিয়ের দিন ছাড়া আর স্বামীর মুখই দেখেনি। একদিন কোনো এক 'মহাপাপ' করে আত্মহত্যা করতে গেছিল। তাকেই উদ্ধার করে বিয়ে করলেন তিনি। খড়গপুরে জন কোলমাইন প্রথম সাহেব যিনি ভারতীয় বিয়ে করেছিলেন।

১৯০১ সালে রেল চলল, ১৯০৩ সালে কারখানা চালু হল। আর ১৯০৬ সালেই বিস্ফোরণের মুখে পড়ল কোম্পানি। খড়গপুরে প্রথম রেলশ্রমিকদের হরতাল চলল সেপ্টেম্বর মাসের ৩ থেকে ৬ তারিখ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তখন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে আবার হরতাল। গোটা শহর যেন বিদেশীদের বিষ নজরে দেখছে। বিশাল খড়গপুর এলাকা গ্রাম - শহর মিলে একশ বর্গমাইলের বেশি। এত বড়ো এলাকা সামলানোর জন্য একটা মাত্র থানা সুতরাং আর একটা থানা চাই শুধু রেলনগরীর জন্য। ১৯১১ সালে বি. নে. আর কোম্পানি ৫০ একর জায়গা ছেড়ে দিল তৎকালীন পুলিশ সুপারকে। শুরু হল খড়গপুরে টাউন থানা শুধুমাত্র একটা শহরের জন্য একটা থানা ? না বাংলাদেশে এখনো এর দ্বিতীয় নজির নেই কেবলমাত্র কোলকাতা ছাড়া। তাও কোলকাতা এখন জেলা কিন্তু আজও খড়গপুর টাউন থানা। শুধু শহরের জন্য রয়ে গেছে। অবশ্য এসব দিয়েও রোখা যায়নি রেল শ্রমিকদের আন্দোলন, ১৯২৭ -এ পর পর দু'বার শ্রমিক হরতাল হল ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর মাসে।

যখন তৈরি হল তখন রেলগাড়ি দেখতে বহু মানুষের ভিড় জমে গেল। দাঁও বুঝে কোম্পানি ঠিক করল কাছ থেকে রেলগাড়ি দেখতে দু'পয়সা দিতে হবে। ইঞ্জিনের গায়ে হাত দিতে চাইলে এক আনা লাগবে। কিন্তু যখন ট্রেন চালু হ'ল তখন কোম্পানির মাথায় হাত কেউ আর ট্রেনেই চাপতে চায় না। তখন বাসের মতই ট্রেনে চেপে টিকিট কাটার বন্দোবস্ত ছিল। পাগড়িওয়ালা টিকিট - মাস্টার যাত্রির কাছে গিয়ে টিকিট কাটতেন চলন্ত ট্রেনে। সেই টিকিট মাস্টার হতভম্ব। ট্রেনে কোন লোক নেই।

মালঞ্চ, 'ইদা, রাখা জঙ্গল, চণ্ডীপুরে লোকেরা জানাল রেলগাড়ির জন্য মড়ক লেগেছে দেশে। বুকে হেঁটে চলা ঐ লোহার সরীসৃপের ধোঁয়ায় বিষ ছড়াবে গ্রামের পর গ্রাম। সেই ধোঁয়া যতদূর যাবে ততদূরই ছড়িয়ে যাবে আল। রেলে উঠলেই জাত যাবে কারণ সেখানে বামুন-বাগদির কোন তফাৎ নেই, সবাইকে একসাথে বসতে হয়। সে সময় অনাবৃষ্টি চলছিল, গ্রামে গ্রামে খারাপ পরিস্থিতি। রেলগাড়িকেই এর জন্যই দায়ী করা হল। কয়েকটা গ্রামে কলেরা ছড়িয়ে ছিল। এর জন্য দায়ি হল রেল, মালঞ্চ গ্রামে যজ্ঞ শুরু হল রেলের বিষ প্রভাব কাটানোর জন্য কিছু ছেলে, ছোকরা ঠিক করল রাতের অন্ধকারে উপড়ে ফেলা হবে রেললাইন। রেললাইন পাহারা দিতে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হল।

।। দশ।।

এই খরা, আকালকেই অস্ত্র করল কোম্পানি। অনাবৃষ্টিতে সেবার ফসল ফলল না। কোম্পানি বলল, রেলের চাকরি নাও ধান পাবে চাল পাবে, ঘরবাড়ি পাবে। খিদের জ্বালায় জাত - পাত মাথায় উঠল। ভিড় বাড়ল শহরে, তৈরি হল আরও ঘর - বাড়ি তবুও রেলে চাপতে কেউ রাজি হয় না, যদি পুল ভেঙে ট্রেন নদীতে পড়ে যায়! কোম্পানি বলল, বিনা পয়সায় যেখানে খুসি যাওয়া - আসা করতে পার আর রেলে চাপলেই মিলবে একটা কম্বল, তিনমাসে দেড় লক্ষ কম্বল বিলিয়ে ছিল। ভয় কাটল মানুষের। শুধু ভয় কাটলই না, রেলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তৈরি হল। কারণ রেলের জন্যই তো এতবড়ো আকালে কেউ মরল না। রেলের জন্যই তো ভাত - ডাল পাওয়া গেল। রেলে চড়ার জন্য এবার লোক পাগল হয়ে উঠল। আর এই পাগলামি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একবার তীর্থ যাত্রার জন্য আঠারোটা স্পেশাল ট্রেন দিয়েছিল কোম্পানি, তাতেও টিকিটের জন্য হাপিত্যেশ করতে হল যাত্রিদের। টিকিট নেই, সব টিকিট বিক্রি হয়েছে। কোনও এক রাম তেওয়ারী সব টিকিট কিনে নিয়েছে। তার কাছে চড়া দামে টিকিট কিনতে হল। কোম্পানি তার নাম দিয়েছিল 'ফাকির' মানে পাইকের। সেই সময় দালালি বুখতে ট্রেনের টিকিটের উপর কোম্পানিকে লিখতে হয়েছিল, 'নট্ ট্রান্সফাররেবল্।' ভালোবাসার রেলকে এবার সম্মান জানাতে শুরু করল। স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থাকলেই, স্নান করা মেয়েরা এলোচুলে এসে রেলের চাকায় তেল - সিঁদুর লাগাত আর গাইত—

রেল রেল রেল
তোমার পায়ে তিই তেল
রেলের কুঠি কতদূর
ব্যাথার পায়ে তেল সিঁদুর
এসো রেল বসো রেল
মুখে জল বাতাসা
চালে - ডালে রেখো তুমি
আমার বাছারে খাসা।
রেল রেল রেল
আমার বাতের দিও মুড়ি, তেল।

খড়গপুর রেল কথা আরও বিস্তৃত, আরও ব্যাপক। এ স্বল্প পরিসরে তার কাহিনী বলা যায় না। মোটামুটি একটা চিত্র দেওয়ার চেষ্টা হল আর কি। এ যুগের যারা খড়গপুরের কিশোর, যারা খুঁজতে চাইবে সেই টিলা দুটি যার ওপর প্রায় ১০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রেল - কারখানা। তাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বলি, রেলওয়ে মেন হাসপাতালের উত্তর দিকে লোকো শেডের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সি. এম. ই গেটের দিকে চলে গেছে কিংবা ধোপীঘাটের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সি.এম.ই গেটে চলে গেছে তার চড়াই ভাঙতে পারেন। অথবা টাউন থানা থেকে গেট বাজারের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে সি. এম. ই গেটের চড়াই ভাঙলেও টিলাটার অস্তিত্ব আজও ভালো করে বোঝা যায়।

আর হিজলী রেল স্টেশনের পাশে আজকের ঝুলি যা ২৭ নং ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। যেখান থেকে দেখা যায় হিজলী জেলের চুড়া। এই ঝুলিতেই এক সময় রিচার্ডস্ সাহেব জংশন করতে চেয়েছিলেন। এই ঝুলিতেই এখন বসবাস করে রিচার্ডস্, ওয়াটসনের বংশধরেরা। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়া। স্বাধীনতার আগে পরে ইউরোপিয়দের কেউ কেউ দেশে ফিরে গেলেও, ওরা যেতে পারেননি। ওদের দেশ কোথায়? ইংল্যান্ড ওদের ভালো চোখে দেখে না, কারণ ওদের ধমনীতে ভারতীয় রক্ত। ভারতবাসী ভাবে

ওরা অ্যাংলো একদিন আমাদের পরাধীন করে রেখেছিল। তাই সবার যাতনা নিয়ে ওরা একপাশে চুপচাপ পড়ে থাকে। খড়গপুর রেলজংশনের পত্তন করেছিলেন ওদের পূর্বপুরুষেরা সেই কথা ভেবে ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তথ্য এবং কৃতজ্ঞতা :

১। প্রথম প্রহর — রমাপদ চৌধুরী।
২। খড়গপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি — শ্যামাপদ ভৌমিক
৩। শাল - মহুয়ার দিন — বিজয়কুমার মণ্ডল।
৪। মেদিনীপুর, মানবসমাজ ও সংস্কৃতি — তারাপদ সাঁতরা।
৫। মেদিনীপুর দর্পণ— হরিসাধন দাস।
৬। বিজয়কুমার মাল।
৭। শেফালি পাঠক।

লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক স্টেটস্ম্যান পত্রিকা।